শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পচেতনার কয়েকটি দিক

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে বাচিক শিল্পী, সুকণ্ঠের অধিকারী ও অভিনয়শিল্পী। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর) যেন মধুভরা...। সে গানে কান ভরে আছে। এখন যে গান শুনি, সে শুনতে হয় তাই শুনি।''[১] তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছেন অগণিত মানুষ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন। কামারপুকুরে গেলে তিনি তাঁকে আদর করে 'গদাইচন্দ্র' বলে অভিহিত করে গান শোনাতে বলতেন।[২] ভারতবর্ষের মানুষ একক অভিনয় বা 'মনোলগ' শব্দই যখন শোনেনি, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সমগ্র যাত্রাপালা একক অভিনয় করে শ্রীশ্রীমা ও বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের মুগ্ধ করেছিলেন।[৩] মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প ও নৃত্যশিল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ এ-প্রবন্ধের বিষয়।

মৃৎশিল্প

একদিন পণ্ডিত রামপ্রসাদ গুপ্ত পড়ুয়াদের কিছু পাঠ দিয়ে অন্যত্র গিয়েছেন। এক কোণে একজন কারিগর প্রতিমা গড়ছিল। পণ্ডিতমশাই উঠে যেতেই গদাই কারিগরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখে মন্তব্য করেন, ''প্রতিমা ঠিক হচ্ছে না।'' কারিগর বলে, সে কেমন শিল্পী একটা মাটির এঁড়ে গরু তৈরি করে দেখাক। কারিগর নিজেও একটি গরু গড়ল। পণ্ডিতমশাই ফিরে এলে কারিগর তাঁকে জিজ্ঞেস করল কোনটি ভাল। পণ্ডিতমশাই গদাধরের মূর্তিটি পছন্দ করলেন; এমনকী তিনি সেটি নিয়ে গিয়ে পূজাও করেছিলেন।[৪] স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, ''গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল।''[৫] এক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীকার লিখেছেন, ''গদাই এখন নয় দশ বৎসরের ছেলে,... মৃত্তিকা লইয়া কখন শিব, শিববাহন বৃষ, ত্রিশূল, শিঙ্গা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া, বিজয়া, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি গড়েন। ঐ সকল মূর্ত্তির গঠন এত নির্দ্দোষ এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইত যে, অল্প দিনেই তাঁহার ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা গ্রামের সর্ব্বত্র রটিল এবং গ্রামে যাঁহার বাটীতেই পূজার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হইত, তিনিই গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা

সুপারিনটেনডেন্ট, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নির্দোষ হইয়াছে কিনা, মত লইতে লাগিলেন।... অনেকসময় গদাই স্বহস্তে ঐ সকল প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া দিতেন।"[৬] "মথুরানাথ প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার সময় রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে লইয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে তবে প্রতিমার চক্ষুদান করা হইত।"[৭] "দেখা যেত, গ্রামের মৃৎশিল্পী যেখানে দেবদেবীর প্রতিমা গড়ছে, ... গদাধর... উপস্থিত হয়েছেন।... বলে বসেন, 'এ কি হয়েছে? দেবচক্ষু কি এরকম হয়?' কী দুঃসাহস বালকের! তিনি এগিয়ে যান। মৃৎশিল্পীর হাতের তুলি নিয়ে নিজ হাতে দুটি টান দেন। সবাই তাজ্জব বনে যায়; মনোহর দেবীমূর্তির দিব্য চাহনি দর্শকদের প্রাণে শিহরণ জাগায়। ঝানু মৃৎশিল্পী গালে হাত দিয়ে ভাবে, গদাই ঠাকুর এ-বিদ্যা শিখল কোথায়?"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিনির্মাণ দক্ষতার বড় নজির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গোবিন্দজীর ভগ্নপদ জোড়া লাগানো। ১৮৫৬ সালে যে-মূর্তির ভগ্নপদ জুড়েছিলেন তিনি, সেটি অক্ষত ছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর ভগ্নপদ বিচ্ছিন্ন হলে নতুন মূর্তি বসানো হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আগে কম বয়সে দেশে ছোট ছোট ঠাকুর গড়তুম। কেষ্টঠাকুর, তাঁর হাতে বাঁশি। এরকম নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তুম।... ছবি আঁকতুম। পুতুল গড়তুম। কল শুদ্ধ হাত পা নাড়ছে এই সব। রাসের মিস্ত্রিরা অনেক সময় আমার কাছে ভঙ্গিমা জেনে নিত।"[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্কিত চিত্র : নন্দলাল বসু কৃত প্রতিলিপি

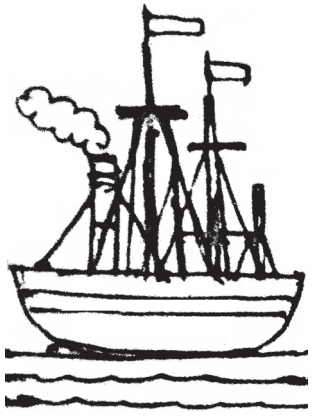

চিত্রশিল্প

তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা দেখা যায় চিত্রশিল্পেও। গদাধর গৌরহাটি গ্রামে ছোটবোন সর্বমঙ্গলার কাছে একবার গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সর্বমঙ্গলা নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা করছেন। কল্যাণশ্রীযুক্ত গৃহস্থবাড়ির দৃশ্য কিশোর শিল্পীর মনে নাড়া দেয়। গদাধর একটি চিত্রে তুলে ধরেন দৃশ্যটি। চিত্রে সর্বমঙ্গলা ও তাঁর স্বামীর নিকটসাদৃশ্য দেখে আত্মীয়স্বজন শিল্পীর প্রতিভার প্রশংসা করেন।[১০]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের উত্তরদিকের দরজার দুপাশে আপন খেয়ালে তিনি দুটি প্রাচীরচিত্র এঁকেছিলেন। একটি ছিল আতাগাছে এক ঝাঁক তোতাপাখি, অপরটি গঙ্গাবক্ষে পতাকা ওড়ানো জাহাজ। চিত্রদুটি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে দৃষ্টিপাত মাত্র দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। কালের করাল গ্রাসে চিত্রদুটি আজ আর নেই। সৌভাগ্যবশত শিল্পী নন্দলাল বসু সেগুলির প্রতিলিপি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এমন আরও দুটি প্রাচীরচিত্রের সংবাদ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাচীন জীবনীকার শশিভূষণ সামন্ত। তিনি জানিয়েছেন, কুঠিবাড়ির দেওয়ালে খড়ি দিয়ে আঁকা পদ্মপাতা ও পদ্মফুল এবং ধানের মরাই-এর চিত্র ছিল এবং সেই দুটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সামনেই এঁকেছিলেন। চিত্র দুটি কেমন দেখতে লাগছে সেই বালকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি। রঙ-তুলি নয়—কাঠকয়লা বা খড়ি দিয়েই আঁকতেন। পরবর্তী

কালে ঘরগুলি রং করা হলে চিত্রগুলি মুছে ফেলা হয়। ফলে হারিয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিল্পসত্তার বড় নিদর্শনগুলি।[১১]

শ্রীশ্রীমা সরযূবালা সেনগুপ্তকে একদিন বলেছিলেন, ''ঠাকুর নিজ হাতে আমাকে কুল-কুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র এঁকে দিয়েছিলেন।" তিনি জানতে চান, ''সেখানি কই, মা?" মা বলেন, ''আহা মা, এত যে হবে তা কি তখন জানি? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না।"[১২]

১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে, রোগশয্যায়। তিনি ''একটি কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নিবিষ্টমনে লেখেন : জয় রাধে! প্রেমময়ী! নরেন শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে-বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে!... জগৎপতি তাঁর নির্বাচিত পুরুষশ্রেষ্ঠকে লোকশিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। সহজ ভাবাবেগে তিনি তাঁর লেখার নীচে আঁকেন একটি তাৎক্ষণিক চিত্র, একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র। ভাবব্যঞ্জনাপূর্ণ একটি মনোরম রেখাচিত্র। চিত্রপটে একটি আবক্ষ মূর্তি। তার আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি স্থির। তার পিছনে ধাবমান দীর্ঘপুচ্ছ একটি ময়ূর। নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে চলেছেন চাপরাসদাতা জগৎপতি। নরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণ।"[১৩]

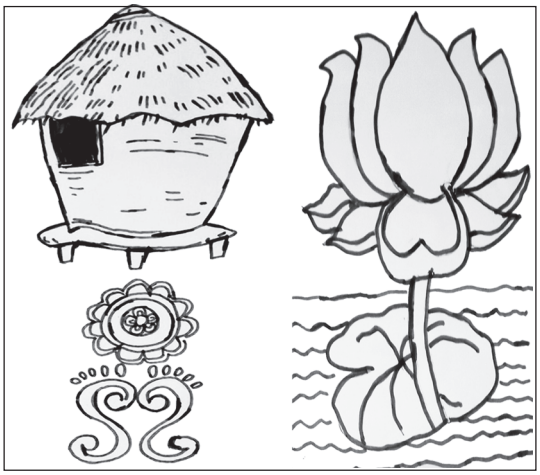

শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্কিত : শশিভূষণ সামন্ত কৃত প্রতিলিপি

নৃত্যশিল্প

শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যগীত আজ কিংবদন্তি। গিরিশচন্দ্রের লেখনীধারায় : ''কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণদেবের নৃত্য দেখিয়াছি। 'নদে টলমল করে' মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন; যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন... তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।"[১৪]

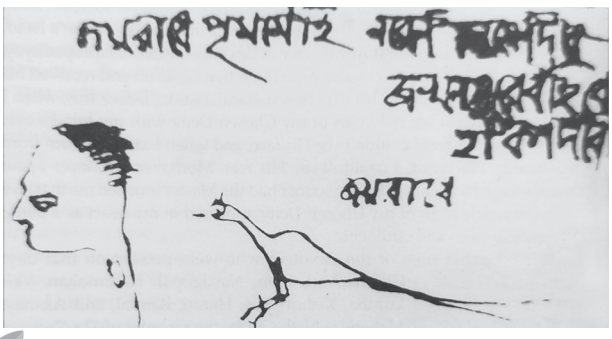

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে শ্যামবাজারে চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে আমন্ত্রিত হয়ে কীর্তনানন্দে যোগ দেন। ''কীর্তনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্ব্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহ-সরসী যেন ভগবৎ- প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত।

আবার কখন বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন। গ্রামগ্রামান্তরের ইতর লোকে বলিতে লাগিল, 'শ্যামবাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে দিনে সাতবার মরে যাচ্ছে আবার বেঁচে উঠ্‌ছে।' "[১৫] গৃহস্থালির কাজ ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাতারে কাতারে মানুষ সমবেত হয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগল। লজ্জা-ভয় ছেড়ে বাড়ির মেয়েরাও এল। পুঁথিকার এই চিত্র ধরে রেখেছেন :

''দরশনে লুব্ধ মন আসিয়াছে ছুটে।
উপায়স্বরূপে লোক চালে গাছে উঠে॥
গাছে উঠে এত লোক দেখিবারে নাচ।
গাছ গোটা বোধ যেন মানুষের গাছ॥"[১৬]

১৮৮৩ সালে পানিহাটির দণ্ডমহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। ''ঠাকুর তীরবেগে এসে সঙ্কীর্তন দলের মধ্যে ঢুকে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। প্রেমোন্মত্ত ঠাকুরের নয়নাভিরাম নৃত্য। উপস্থিত জনসাধারণের প্রাণে শিহরণ খেলে যায়। নৃত্য করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন।... চারদিক থেকে হরিধ্বনির কল্লোল ওঠে। ভক্তগণ ঠাকুরের চরণে ফুল ও বাতাসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। প্রেমহিল্লোল জনসমষ্টিকে মাতিয়ে তোলে। ঠাকুরকে দেখবার জন্য জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি চলতে থাকে। ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করেন।... নাম-গান ধরেন : যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা দুভাই এসেছে রে... ইত্যাদি। ঠাকুরের সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে নাচছেন ভক্তগণ। তাঁদের কারও কারও বোধ হয়, একাধারে গৌর ও নিতাই তাঁদের সাক্ষাতে নাচছেন।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পচেতনা যেমন নান্দনিক তেমনই বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক—যা মানুষের অন্তরকে শুদ্ধ করে। তাই তাঁর কথা-গল্প-নৃত্য-গীত শুধু মুগ্ধই করে না, এক বৃহত্তর চেতনা জাগায়। ✠

তথ্যসূত্র

১। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ৩২
২। দ্রঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমকালের কামারপুকুর*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৫, পৃঃ ৩০২
৩। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২৯
৪। দ্রঃ স্বামী প্রভানন্দ, *আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০, পৃঃ ৬৮
৫। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ১, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৫, পৃঃ ৯৩
৬। গুরুদাস বর্মন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত*, ১৩১৬, পৃঃ ১৫-১৬
৭। তদেব, পৃঃ ৭০
৮। *আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, পৃঃ ৬৮
৯। স্বামী প্রভানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা*, খণ্ড ২, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩
১০। দ্রঃ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃঃ ১৪২
১১। শশিভূষণ সামন্তের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। সংগ্রহ : তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ৩৩
১৩। *শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা*, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৮
১৪। *আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, পৃঃ ১০৭
১৫। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত*, পৃঃ ১৫৪-৫৫
১৬। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯২, পৃঃ ২২৪
১৭। স্বামী প্রভানন্দ, *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১, পৃঃ ৮৩